আওরঙ্গজেব

শহীদ আখন্দ



আওরঙ্গজেব

শহীদ আখন্দ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আওরঙ্গজেব

শহীদ আখন্দ

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১১৭৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২৩·১৫৪
ISBN : 984-06-0407-7

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট–১৯৮৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুন ১৯৯৭
আষাঢ় ১৪০৪
সফর ১৪১৮

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

প্রচ্ছদ
কামাল তালুকদার

অলংকরণ ঃ মতিউর রহমান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

মূল্য ঃ ১৬·০০ টাকা

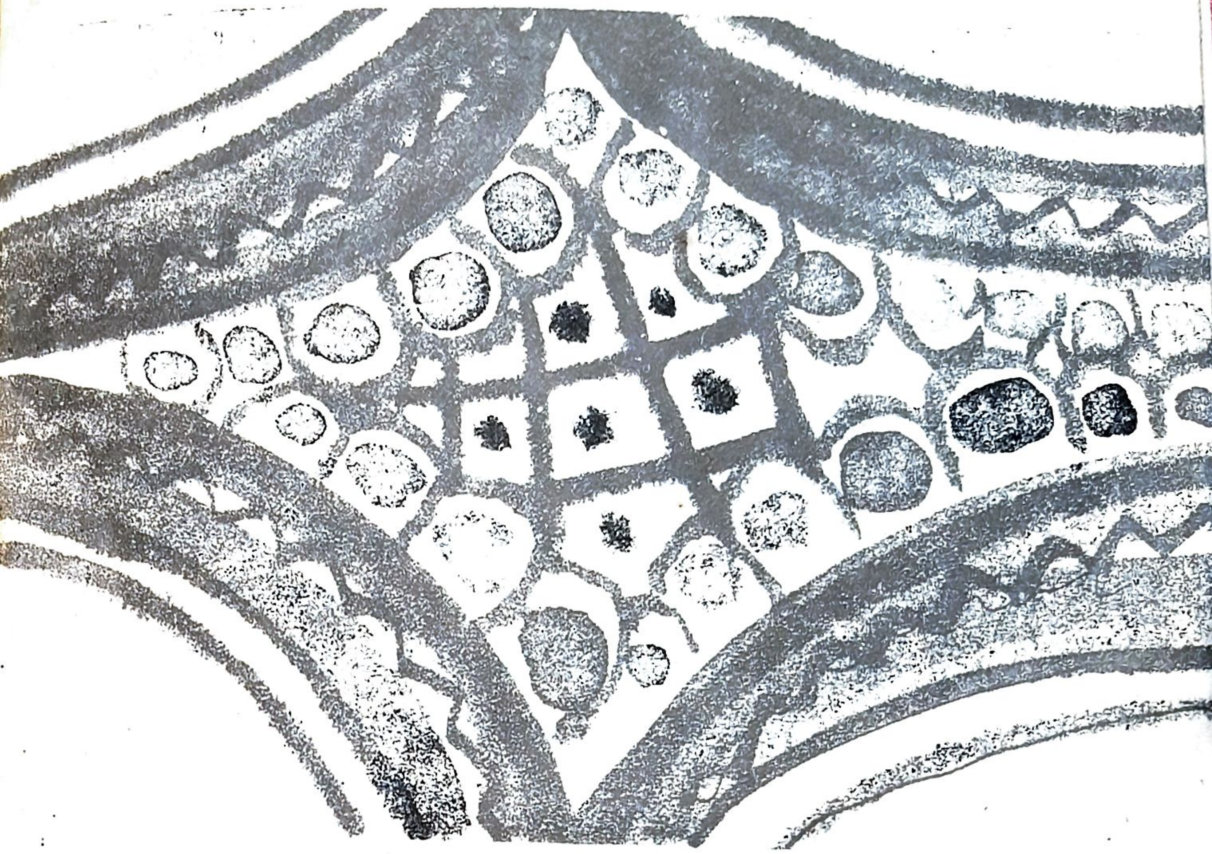
AURANGJEB (Life-sketch of Aurangjeb): written by Shaheed Akhand in Bengali and published by Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000. June 1997

Price : Tk 16·00 ; US $: 0·75

উৎসর্গ

সোমা সুমন
সিমি ও সেবা কে।





প্রকাশকের কথা

মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব। ভারতের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি। কতো তাঁর উযির-নাযির, কতো সিপাই-সান্ত্রী। কিন্তু তিনি জীবন-যাপন করতেন সাধারণ মানুষের মতো, ফকির-দরবেশের মতো। তিনি ছিলেন আল্লাহ্ প্রেমিক। কারো রোষ, কোন ভালবাসা, বিপজ্জনক প্রভাব, কিংবা কারো চোখের পানি—আদর্শের ব্যাপারে কিছুতেই নরম হতেন না তিনি। ধর্মের প্রতি অসীম অনুরাগের জন্যে সবাই তাঁকে নাম দিয়েছিলেন 'আওরঙ্গজেব জিন্দাপীর'।

সেই জিন্দাপীর আওরঙ্গজেব-এর সহজ-সরল জীবনের কথা সুন্দর মনোরম ভাষায় বলা হয়েছে এই বইয়ে। বইটি ছোটদের জন্য লেখা। কিন্তু নিরহঙ্কার এই মহান সম্রাটের জীবন-কথা থেকে বড়রাও অবশ্যই জীবনকে নতুন করে দেখার ও জানার অনুপ্রেরণা পাবেন। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার মুহূর্তে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি, পূর্বের মতই যেন বইটি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। আমীন।

সেই কতোদিন আগের কথা।

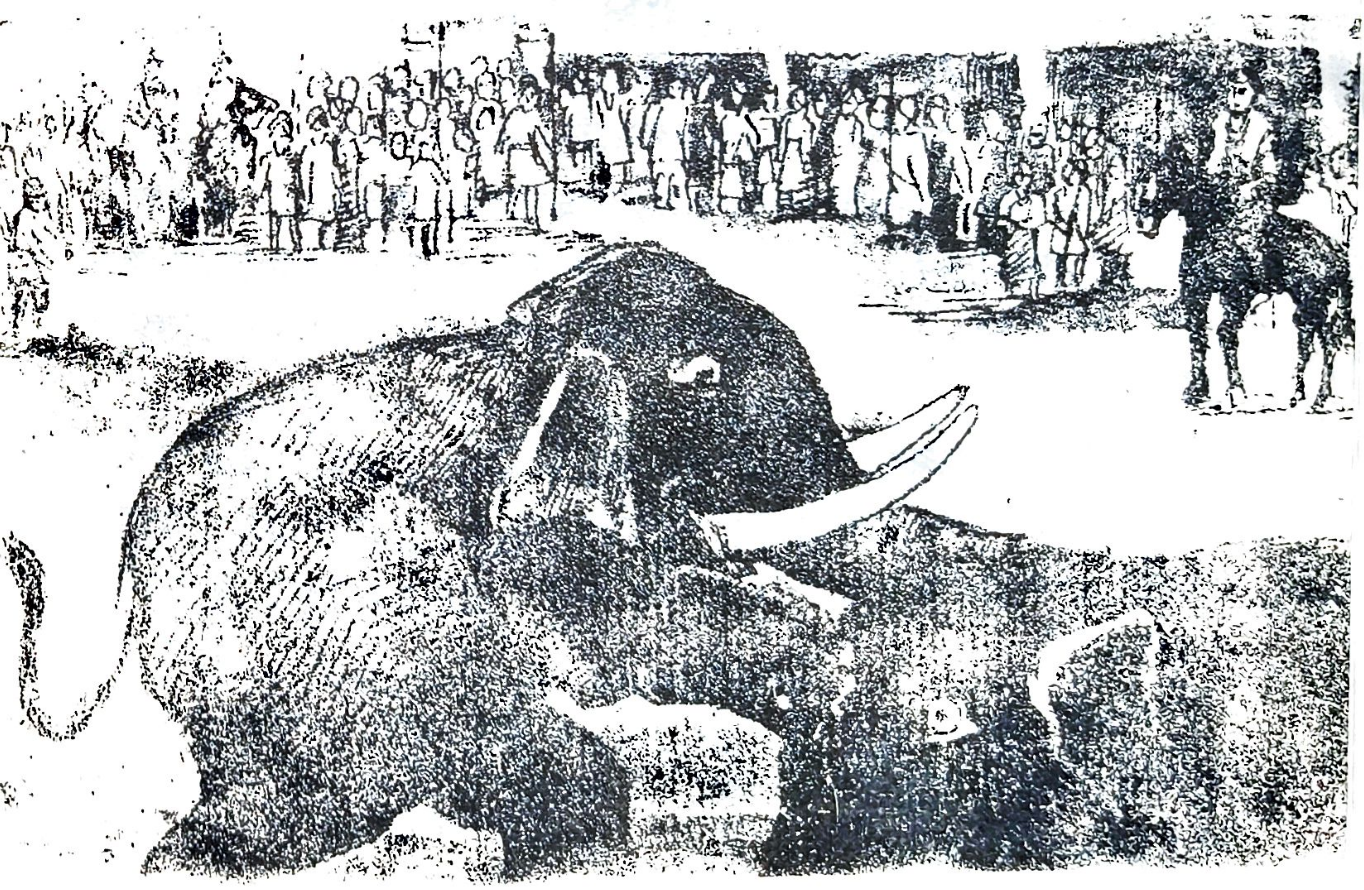
তখন রাজা ছিল, বাদশা ছিল। ছিল উযির-নাযির, সিপাই-সান্ত্রী। আরো কতো কি!

সেই সব রাজা-বাদশার আবার নানান রকম খেয়াল থাকতো। তাদের আনন্দ দানের জন্য থাকতো নানান ধরনের খেলার আয়োজন। এমনি ধরনের খেলা ছিল হাতীর লড়াই।

হাতীর লড়াই?

হ্যাঁ হাতীর লড়াই। দুই প্রকাণ্ড হাতীকে লাগিয়ে দেওয়া হতো লড়াইয়ে। একটা আরেকটাকে দেখে রেগে যেতো, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়তো অন্যটির উপর।

প্রায় সাড়ে তিন শ বছর আগে এমনি এক হাতীর লড়াই হয়েছিল যমুনা নদীর তীরে আগ্রার দুর্গের প্রাঙ্গণে।



রাজা এসে বসেছেন প্রাসাদের অলিন্দে। হাতীর লড়াই দেখবেন তিনি সেই খোলা বারান্দায় বসে। সঙ্গে তাঁর জনাকয় পারিষদ।

রাজার চার ছেলে কিন্তু লড়াই দেখবে প্রাঙ্গণের ভিতরে ঘোড়ায় চড়ে। মানে যেখানে লড়াই হবে, তার ধারে কাছে তারা থাকবে।

লড়াই শুরু হয়ে গেল সুধাকর আর সুরতসুন্দরের মধ্যে।

বুঝতেই পারছো ওগুলো হাতীর নাম। তখন তো রাজা-বাদশাদের পোষা সমস্ত জীব-জানোয়ারের খুব বাহারের নাম থাকতোই!

সুধাকর ছিল দাঁতাল। যে হাতীর দাঁত থাকে তাকে বলে দাঁতাল হাতী। আর সুরতসুন্দর ছিল দাঁতবিহীন। কিন্তু হলে কি হবে, যুদ্ধের সময় কার দাঁত আছে কার নেই ওসব মনে থাকে নাকি! লেগে গেল এদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ।

খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন সম্রাট।

লড়াইর মাঠে চার রাজপুত্র, ঘোড়ায় সওয়ার।

অনেকক্ষণ ধরে চলল সেই যুদ্ধ দুই হাতীর মধ্যে।

তারপর দাঁতাল হাতী সুধাকরের আক্রমণের সামনে আর টিকতে পারল না সুরতসুন্দর। সুরতসুন্দর রণে ভঙ্গ দিল। উল্টোদিকে ফিরে সে সোজা ভোঁ দৌড়! দৌড়ে সে পালিয়ে গেল। কিন্তু দৌড়ে পালিয়ে গেলেই তো হলো না!

সুধাকরের যুদ্ধের শখ যে তখনো মিটেনি। শরীরটা তার মাত্র গরম হয়েছে। সমস্ত শরীরে রাগ নিশপিশ করছে। দুশমন তার পালিয়ে গেছে। এখন সে তার রাগ মিটায় কি করে? সুধাকর তখন কি করল জানো?

দারুণ রঙচঙে পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে মজা দেখছিলো চার রাজপুত্র; সেই দৃশ্য তার সহ্য হলো না। কাজেই ওদিকেই সে তেড়ে গেল তার ভয়ঙ্কর দাঁত উঁচিয়ে।

রাজ্যের ভবিষ্যত রাজা হলো রাজপুত্র। পাগলা হাতী তাঁদের আক্রমণ করে বসল! সর্বনাশ! খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিলেন শাহানশাহ্, তাঁর তো চক্ষুস্থির!

ভয়ে অস্থির হয়ে গেল সমস্ত পারিষদ। সিপাই-সান্ত্রী, উযির-কোতয়াল। অথচ এমন আচম্বিতে ঘটনাটি ঘটে যাচ্ছে, কারো কিছু করার নেই। কি হয় না হয়, রুদ্ধশ্বাসে তারা দেখতে লাগল।

তারপর কি হলো ?

ভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেলো রাজপুত্রেরা। যে যেদিকে পারে। প্রাণের ভয়ে, প্রাণ নিয়ে।

তিন রাজপুত্র পালালো তিনদিকে।

আর বাকি একজন ? বাকি একজনের কি হলো ? রাজপুত্র চারজন ছিলো না ?

বাকি একজনের ঘোড়াও পিছন দিকে ফিরে দৌড়ে পালানোর জন্য ভীষণ তড়বড় করছিল। তীক্ষ্ণ হ্রেষা রবে সবাইকে সে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু রাজপুত্র শক্ত হাতে ধরে রইলো লাগাম। এক হাতে লাগাম ধরে রাখলো প্রাণপণে। অন্য হাতে উদ্যত বর্শা। সুধাকর দেখল তার সামনে একজন মাত্র আছে। তাকেই সে আক্রমণ করবে। তাকে মেরে কুপোকাত করে নিজের রাগ ঠাণ্ডা করবে সে।

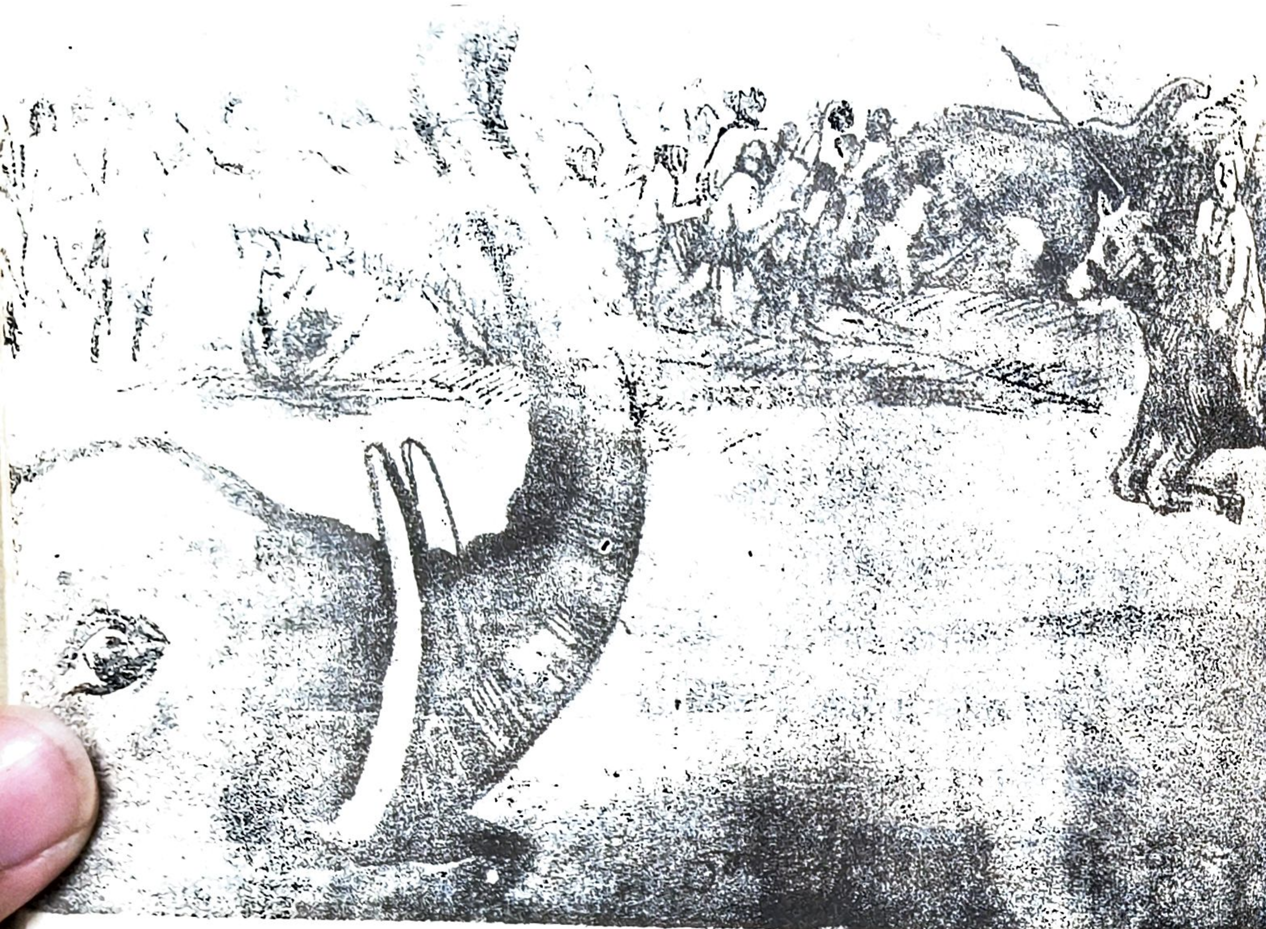
তেড়ে আক্রমণ করতে গেল সে রাজপুত্রকে!

নির্ভীক রাজপুত্র প্রচণ্ড বেগে নিক্ষেপ করলো বর্শা নির্ভুলভাবে লক্ষ্য স্থির করে। বর্শা গিয়ে বিদ্ধ হলো সুধাকরের কপালে।

ক্ষেপে গেল সুধাকর।

সে পাল্‌টা আক্রমণ করল রাজপুত্রকে।

রাজপুত্রের ঘোড়া দাঁতাল হাতীর আক্রমণে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। ছিটকে পড়লো রাজপুত্র।



ছিটকে পড়লো, কিন্তু সাহস হারালো না, এতটুকু ভয় পেলো না। চোখের পলকে হাতে তুলে নিলো নিক্ষিপ্ত বর্শাটি। সেটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। রাজপুত্র বর্শা তাক করলো উদ্যত সুধাকরের দিকে। সুধাকর এগিয়ে আসছে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে আর রুদ্ধশ্বাস ভয়ে দেখছেন বাদশাহ্, পারিষদ, সিপাই-সান্ত্রী। ধেয়ে আসছে সুধাকর রাজপুত্রের দিকে।

হঠাৎ তখন গোলা-বারুদ আর পটকার বিকট আওয়াজে চারদিক মুখরিত হয়ে গেল।

চারদিক থেকে আসা কান-ফাটানো পটকার শব্দে থতমত খেয়ে গেল সুধাকর। সেই ফাঁকে চারদিক থেকে ছুটে এল লোক-লস্কর, সিপাই-সান্ত্রী। ব্যালকনি থেকে নেমে এলেন বাদশাহ্।

এবং কি আশ্চর্য! কোথেকে সুরতসুন্দরও এসে হাযির! দ্বিগুণ তেজে আচমকা তেড়ে গেল সে সুধাকরের দিকে।

হঠাৎ এই বিকট পটকার শব্দ, লোকজনের আনাগোনা, আর কথা নেই, বার্তা নেই, সুরতসুন্দরের এই অপ্রত্যাশিত আগমন! ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সুধাকর।

পালালো, সুধাকর তখন পালালো।

বেঁচে গেলো সাহসী রাজপুত্র।

ছুটে এলেন সম্রাট। ভয়ে তিনি বাকহারা হয়ে গেছেন।

হাতে বর্শা, রাজপুত্র ধীরপায়ে এগিয়ে চললো পিতার দিকে।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন অস্থির শাহানশাহ্! অথচ ধীরপায়ে হেঁটে যাচ্ছে গম্ভীর রাজপুত্র তাঁর দিকে। ব্যাপারটা দেখতেও কেমন খারাপ লাগছে। রাজা অস্থির হয়েছেন, অথচ রাজপুত্র অচঞ্চল। এই দৃশ্য একজন রাজপুরুষের সহ্য হলো না।

তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "এটা কী ধরনের আচরণ আপনার রাজপুত্র! শাহানশাহ্ আসছেন আপনার দিকে দৌড়ে, আর আপনি আস্তে আস্তে হাঁটছেন? আপনি এমন ভাব করছেন যেন কিছুই হয়নি।"

ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে রাজপুত্র জবাব দিলেন, "এখানে হাতীটা থাকলে আমি দৌড়েই যেতাম। কিন্তু এখন তো অস্থির হওয়ার কোন কারণ দেখছি না আমি।"

তারপর পিতার কাছে এগিয়ে এল পুত্র।

জড়িয়ে ধরলেন পুত্রকে পিতা।

এই বীরত্বে অভিভূত হলেন সম্রাট। ভীষণ খুশি তিনি!

রাজপুত্রকে পুরস্কার হিসেবে কি দিলেন জানো?

আনন্দের আতিশয্যে সম্রাট পারলে সমস্ত রাজ্য দিয়ে দেন রাজপুত্রকে। যা পেলেন হাতের কাছে তা-ই দিলেন তিনি তাঁর বীর পুত্রকে।

প্রথমেই বললেন, "তুমি আমার গর্ব। যে সুধাকরকে তুমি ঘায়েল করেছো, সে সুধাকর আজ থেকে তোমার। আর এই নাও তোমার বীরত্বের পুরস্কার।"

সম্রাট পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রার এক থলে তুলে দিলেন রাজপুত্রের হাতে। আর হাতের কাছে যা পেলেন তা-ই তিনি দিয়ে দিলেন রাজপুত্রকে। সব উপহারের সেই তখনকার দিনেই দাম ছিল দুই লক্ষ টাকা।

তবু সম্রাটের মন ভরে না।

তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে আবার বললেন, "আল্লাহ্‌র কাছে হাজার শুক্‌রিয়া, একটা ভয়ানক ফাঁড়া কেটে গেছে। খোদা না করুক, যদি হাতীর হাতে জান যেতো তোমার, কি নিদারুণ এক কেলেঙ্কারী যে হতো!"

তখন রাজপুত্র বললেন, "হাতীর হাতে আমি মরলেও কোন কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হতো না আব্বা। কেলেঙ্কারীর কাজ করেছে আপনার অন্য ছেলেরা—তারা আপনার ইজ্জত নষ্ট করেছে। তারা কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেছে জান নিয়ে। আমি বীরের মতো লড়েছি। জানের মায়া করিনি। কাজেই মরলেও আমি ইজ্জতের সাথেই মরতাম।"

কি নাম ? কি নাম ছিল রাজপুত্রের ? সত্যি সত্যি রাজপুত্র তো ?

নাকি রূপকথা ?

রূপকথা নয়।

সত্যিকারের রাজপুত্র। সত্যি ঘটনা।

রাজপুত্রের নাম ছিল শাহজাদা আওরঙ্গজেব। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর।

খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতীর লড়াই দেখছিলেন সম্রাট শাহজাহান স্বয়ং। পালিয়ে গিয়েছিলো যাঁরা তাঁদের নাম হলো, দারা শুজা আর মুরাদ। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে। যমুনা নদীর তীরে। আগ্রা দুর্গের প্রাঙ্গণে।

আওরঙ্গজেব নামেই কেবল নয়, কাজেও শাহজাদা ছিলেন। এই ঘটনা তার প্রমাণ।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের সিংহাসনে তিনিই বসেছিলেন পিতা শাহজাহানের মৃত্যুর পর।

তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬১৮ খৃস্টাব্দের ২৪শে অক্‌টোবর।

কেবল সাহস থাকলেই কিন্তু সাফল্য আসে না।

বোকা মানুষের সাহস থাকলেই কি আর না থাকলেই কি! বরং বোকার সাহস থাকাই বিপজ্জনক। হয়তো যেখানে একটি আঙুলে টোকা দিলে কাজ সেরে যায়, সেখানে সে বিরাট এক কামানই দেগে বসল। কথায় আছে না, ফেরেশতা যেখানে যেতে ভয় পায়, বোকা সেখানে ডুব দেয়।

আওরঙ্গজেবের কিন্তু বুদ্ধি ছিল ভীষণ তীক্ষ্ণ।

শাহজাদারাই তো রাজা হয়! তাদের একটা-দুটো গুণ থাকলে হয় না; অনেক গুণ থাকতে হয় তাদের। তবেই তারা রাজা হতে পারে!

এটা আবার কি রকম উল্‌টা-পালটা কথা হলো!

শাহজাদা হলেই তো রাজা হয়! তাদের আবার গুণের কি প্রয়োজন? রাজার ছেলেই হলো রাজপুত্র, শাহজাদা! রাজা মরলেই তো রাজপুত্র, শাহজাদা রাজা হবে। কই, রাজা মরে গেছে, রাজপুত্র রাজা হয়নি, প্রজা হরিদাস পালের ছেলে রাজা হয়েছে একথা তো কেউ কোথাও কোনদিন শোনেনি! বাস্তবে দূরের কথা, রূপকথা কল্পকাহিনীতেও কেউ কোনদিন শোনেনি।

সত্য, সত্য, সত্য।

কিন্তু কথা হলো, রাজার একমাত্র পুত্র থাকলে না হয় সে-ই রাজা হবে মানলাম। কিন্তু দুই, তিন বা চার পুত্র থাকলে?

কেন, বড় যে জন সে-ই হবে!

কিন্তু তার যদি কোন গুণ না থাকে ? না সাহস, না শক্তি, না বুদ্ধি ? তাহলেও রাজা হবে ? তাহলে তো পাশের রাজ্যের রাজা সে রাজ্য একচালে দখল করে নিয়ে পথে বসাবে রাজাকে, সব্বাইকে।

কাজেই বুঝতেই পারছো কেবল বড় হলেই হয় না, রাজা হতে হলে রাজকীয় গুণ থাকা চাই। বুদ্ধি থাকা চাই।

আওরঙ্গজেবের বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ।

শাহজাহানের বড় ছেলে দারাশিকো।

আগ্রায় তাঁর জন্য এক বিরাট প্রাসাদ তৈরি করা হলো। দারাশিকো প্রাসাদে প্রবেশ করার পর পিতা শাহজাহান এবং তাঁর তিন ভাইকে দাওয়াত করলেন।

সেটা ছিল গরমের সময়।

তখন সেই প্রাসাদের নিচে ভূ-গর্ভে একটা ঘর তৈরি করা হয়েছিল। সে ঘরের সঙ্গে ছিল নদী যমুনা। সেই সুদূর আলেপ্পো থেকে বড় বড় এক মানুষ উঁচু আয়না আনা হয়েছিল। আয়না লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল নদীর দিকের দেয়ালে।

দারা পিতা আর তাঁর ভাইদের নিয়ে যেতে চাইলেন সেই ঘরে। ইচ্ছা, ঘরটা কি রকম হয়েছে সবাইকে দেখাবেন।

সবাই গেল।

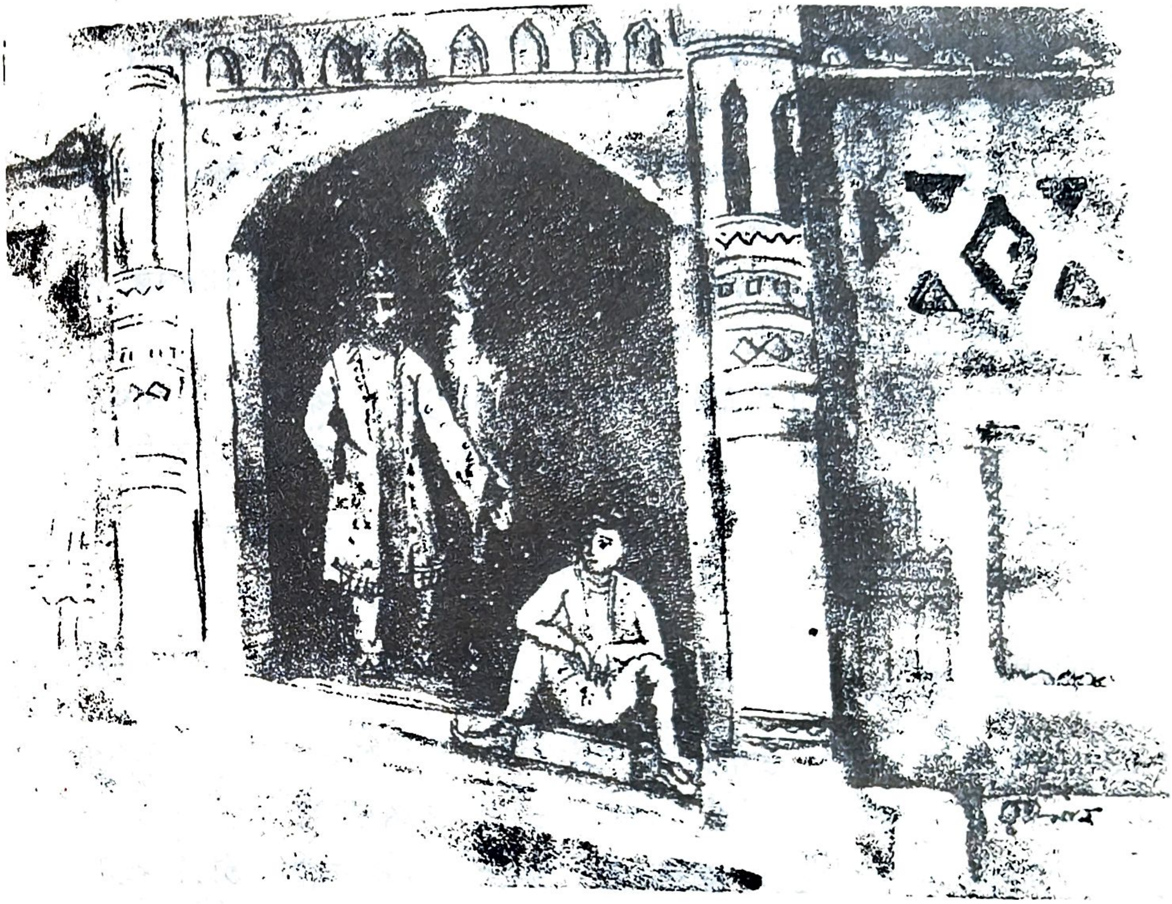
কিন্তু বেঁকে বসলেন আওরঙ্গজেব।

তিনি যাবেন না, কিছুতেই যাবেন না।

যাবেন তো না-ই, একেবারে লেপটে বসে পড়লেন নদীর সঙ্গে লাগানো সেই মাটির নিচেকার অত্যাশ্চর্য ঘরের একমাত্র দরজার উপরে। মেঝেয়।

দেখে দারা চোখ টিপলেন।

ইঙ্গিতে সম্রাটকে বোঝালেন, দেখেছেন আব্বা, আপনার ছোট ছেলের রুচি! কি নোংরা, একেবারে মাটিতে বসে পড়ল!



সম্রাট বললেন, "ছিঃ! ওটা কি বসার জায়গা হলো ? যেখানে ভালমানুষ বসে সেখানেই তো তোমার বসা উচিত। অবশ্য আমি জানি তুমি খুব সহজ সাধারণভাবে থাকতে পছন্দ কর। কিন্তু তাই বলে একেবারে পথের মাঝখানে মেঝের উপরে বসে পড়বে! এদিক দিয়ে যে লোকজন যাতায়াত করে।"

আওরঙ্গজেব তেমনি বসে রইলেন।

বললেন, "আপনার এ কথার জবাব আমি এখন দেবো না আব্বা হুযূর। সময় হলে, আর একদিন দেবো।"

তার কিছুদিন পর যোহ্‌র নামাযের সময় হলো।

আওরঙ্গজেব কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন নিজের ঘরে। তখন রেওয়াজ ছিল, কেউ সম্রাটের কাছে থাকলে, ওখান থেকে অন্য কোথাও

যেতে হলে সম্রাটের অনুমতি নিতে হতো। আওরঙ্গজেব অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না।

সম্রাট শাহজাহান এ কথা শুনলেন। ভীষণ বিরক্ত হলেন। এতটুকু ছেলের এত বড় বেয়াদবী তিনি সহ্য করতে পারলেন না।

কাজেই তিনি শাস্তি দিলেন, আগামী সাত মাস আওরঙ্গজেব রাজদরবারে প্রবেশ করতে পারবেন না।

রাজদরবার হলো রাজার উপযুক্ত স্থান, রাজপুত্র, সভাসদ সবাই সেখানে বসেন, রাজকার্য পরিচালনা করেন, বিচার করেন। ওখানে যেতে নিষেধ করা মানে এক কঠিন শাস্তি প্রদান করা।

হোক কঠিন, আওরঙ্গজেব মাথা পেতে নিলেন সে শাস্তি।

সাত মাস পর।

সম্রাট মনে মনে ভাবছিলেন, ব্যাপারটা কি ? আওরঙ্গজেব একরোখা সত্য, কিন্তু বেয়াদব তো নয়। নিশ্চয়ই ভেতরে কোন রহস্য আছে।

সম্রাটের প্রিয় কন্যা জাহানারা। ভীষণ আদর করেন তাঁকে সম্রাট জাহানারা বলতে গেলে সম্রাটের সুখ-দুখের সঙ্গী। পিতা-পুত্রীর মধ্যে বড় মধুর সম্পর্ক। সম্রাট তাঁকেই কাজটা দিলেন। আসল ব্যাপারটা কি, জানতে হবে।

জাহানারা জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার আলমগীর ? সেদিন তুমি দরজায় পথের মধ্যে ধপাস্ করে বসে পড়লে, তারপর আব্বা হুযূরের কাছে কিছু না বলে চলে এলে ? বিষয়টা কি খুলে বলো তো!"

আওরঙ্গজেব জবাব দিলেন, "খুলে বলব ?"

"হ্যাঁ, বলো!"

"আপনি জানতে চান আপাজি, না আব্বা-হুযূর জানতে চেয়েছেন ?"

"আব্বা-হুযূর জানতে চেয়েছেন।"

আওরঙ্গজেব বললেন, "কথা হলো, মাটির নিচে ঘর। তাতে দরজা মাত্র একটা। ভেতরে ঢুকে গেলেন আব্বা-হুযূর। ঢুকে গেলাম আমরা চার

ভাই। তারপর বড় ভাই আমাদের দাওয়াত করেছেন, তদারকি করবার জন্য তার তো আসা-যাওয়ার দরকার হবেই। ধরুন আপা, ভিতরে আব্বা হুযূর আর আমরা তিন ভাই। একটিমাত্র দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া করছেন বড় ভাই। তারপর হঠাৎ যদি কোন খেয়ালে বড় ভাই সেই ঘরের একমাত্র দরজাটি বন্ধ করে দেন, তাহলে? তাহলে কি হতো কেউ ভেবে দেখেন নি। আমি দেখেছিলাম।"

জাহানারা প্রশ্ন করলেন, "হঠাৎ দরজা দারা বন্ধ করবে কেন?"

"কেন করবে, কারণের কি অন্ত আছে? রাজপ্রাসাদ তো চক্রান্তের জায়গা। আপনাকে আমি আর নতুন কি শেখাবো আপা।"

একটু পর আওরঙ্গজেব আবার বললেন, "কিংবা ধরুন, ইচ্ছা করে নয়, এমনিতেই যদি বন্ধ হয়ে যেতো দরজাটা বাইরে থেকে? আমরা সবাই আটকা পড়তাম! কাজেই আমি বসে রইলাম দরজায় প্রহরীর মতো। আব্বা হুযূর আমাকে ভুল বুঝলেন। আমাকে বকলেন। কাজেই আমি রাগ করে তাঁকে কিছু না বলে চলে এলাম। এখন আপনিই বলুন আপা, কি আমার অপরাধ?"

জাহানারা এসব কথা সম্রাটকে জানালেন।

সম্রাট সব শুনে ভীষণ অবাক হলেন! এই বয়সে এত দূরদর্শিতা, এত বিবেচনা! তিনি খুব আনন্দিত হলেন।

আওরঙ্গজেবকে অনেক পুরস্কার দিলেন।

তাঁকে গভর্নর করে পাঠালেন দাক্ষিণাত্যে।

আর একটি ঘটনা।

তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ভারতবর্ষের সিংহাসন নিয়ে।

কে বসবে দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট শাহজাহানের পর?

বড় ছেলে দারাশিকো।

তিনি থাকেন পিতার সঙ্গে সঙ্গে। পিতার তিনি সহচর, পিতার তিনি ন্যাওটা। কিন্তু আওরঙ্গজেব তা চান না। তিনি সম্রাট হতে চান। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, কেবল সম্রাট হলে চলবে না। যিনি সম্রাট হবেন, তাকে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হবে। সে ক্ষমতা দারার নেই, সুজার নেই, মুরাদের নেই। তিনি বিশ্বাস করেন, চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে কেবল তিনিই পারবেন সাম্রাজ্য অটুট রাখতে। তিনিই পারবেন সমস্ত বিশৃঙখলা দমন করে অবাধ্য প্রজাদের ঠাণ্ডা করে রাজ্য শাসন করতে।

অতএব তাঁকে সম্রাট হতেই হবে।

অতএব বুদ্ধির খেলায় তাঁকে জিততে হবেই। শক্তি পরীক্ষায়ও তাঁকে জয়ী হতে হবে।

আওরঙ্গাবাদ থেকে তিনি এসে শিবির স্থাপন করলেন রাজধানী দিল্লী থেকে চার মাইল দূরে আরসুলে।

হুকুম দিলেন, এখানে তাঁরা দশ দিন অবস্থান করবেন।

তখন আওরঙ্গজেবের হুকুমের বিরুদ্ধে কথা বলার লোক বড় একটা ছিলো না কেউ। কারণ সবাই জানতো, তিনি যা করেন, ভেবেচিন্তে করেন।

নাজাকাত খান ছিলেন তাঁর বন্ধু এবং বিশ্বস্ত অনুচর।

তিনি বললেন, "দারাশিকো জানে, আপনি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এতদূর থেকে এসেছেন। এখন যদি শহর থেকে মাত্র চার মাইল দূরে এসে আপনি দশ দিন এক জায়গায় থাকেন, তাহলে তো তাঁর সাহস বেড়ে যাবে।"

"কি ভাবে সাহস বেড়ে যাবে?"

"দুশমন যখন জানবে এতদিনের জন্য আমরা এখানে অবস্থান করছি, তখন সে ভাববে আমরা দুর্বল, এগোতে ভয় পাচ্ছি। কাজেই তখন সে আমাদের পরাস্ত করার জন্য খুব শক্তিশালী সৈন্যদল পাঠাবে।"

আওরঙ্গজেব হাসলেন। বললেন, "আমিও তো তা-ই চাই। সেটাই তো আমার নীতি।"

নাজাকাত খান প্রশ্ন করলেন, "কি রকম ? বুঝলাম না।"

আওরঙ্গজেব বললেন, "আমরা যদি একটানে রাজধানীতে চলে যাই, তাহলে তো দারা-ভাইয়ের গোটা সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। হবে না ?"

"তা তো হবেই।"

"এক জায়গায় একসঙ্গে তাঁর সমস্ত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে আমার। কাজটা কি আমার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে না ?"

"তাই তো।"

আওরঙ্গজেব বললেন, "আর যদি আমরা এখানে দেরী করি, তাহলে দারা-ভাই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তাঁর সেনাবাহিনীর একটি দল পাঠাবেন। একটা গোটা বাহিনীকে পরাজিত করার চেয়ে একটি দলকে পরাজিত করা ঢের সহজ। ঠিক কিনা ?"

নাজাকাত এতক্ষণে বুঝলেন যেন। শক্তি ভাগ হয়ে গেলেই তো শক্তি দুর্বল হয়। দুইজন একসঙ্গে থাকলে তাদের পরাস্ত করা যতো কঠিন, একজন একজন করে তারা এলে তাদের পরাস্ত করা তত কঠিন হয় না।

নাজাকাত খান বললেন, "আপনার নীতি সম্পূর্ণ ঠিক। দারা নিশ্চয়ই রাজধানী থেকে সব সৈন্য এখানে পাঠাবেন না, তাহলে রাজধানী অরক্ষিত থাকবে। আর তিনি নিজেও আসবেন না। কারণ এখানে এলে তাঁর ভয় থাকবে, তিনি হয়তো আর ফিরে যেতে পারবেন না। অতএব আপনাকে দমন করতে হলে তাঁর শক্তিকে ভেঙ্গে একদল সৈন্য পাঠাতেই হবে।"

তিনি জানতেন শত্রুকে দুর্বল করতে পারলে শত্রুকে জয় করা সহজ হয়, বস্তুত তাই তিনি করেছিলেন।

এবং তার ফলে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

আসলে তাঁর লক্ষ্য স্থির করাই ছিল।

তাঁর লক্ষ্য ছিল, তিনি সিংহাসনে বসবেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন তিনি সকলের চেয়ে যোগ্য।

লক্ষ্য একবার ঠিক করতে পারলে, সঠিক পথে অগ্রসর হলে, লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

আওরঙ্গজেব তার প্রমাণ।

তোমরাও প্রথমে লক্ষ্য ঠিক করবে। প্রথমে ঠিক করবে কি তোমরা হতে চাও। তারপর ঠিক করবে, যা তোমরা হতে চাও, তা হতে হলে কি কি করা দরকার। একাগ্রচিত্তে তা করে যাও। দেখবে, ঠিক সম্রাট আওরঙ্গজেবের মতো তোমরাও যা হতে চাও তাই হতে পেরেছো।

রাজকীয় গুণ বলতে কেবল কি শৌর্য-বীর্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বোঝায়? রাজ্য শাসনের জন্য আর কোন গুণের প্রয়োজন হয় না? সাধারণ একজন ভাল মানুষের যে সব গুণ থাকে, তা কি রাজার থাকতে নেই?

আওরঙ্গজেব জানতেন, একা তিনি সম্রাট হলে কি হবে, তাঁকে সাহায্য করার জন্য অনেক বিশ্বস্ত মানুষের প্রয়োজন। বিশ্বস্ত মানুষের সহযোগিতা পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তাদের জয় করা।

কেমন করে মানুষকে জয় করা যায়?

তিনি দেখলেন, বড় ভাই দারাশিকো কিছু আমীর-ওমরাহের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। তাঁদের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেন। ঔদ্ধত্য দেখান। রূঢ় ভাষায় তাঁদের ওপর হুকুম জারি করেন। ফলে আলী মর্দান খান, সাদুল্লাহ্ খান, সৈয়দ মিরানের মতো সম্ভ্রান্ত মানুষ তাঁর প্রতি খুব ক্ষেপে আছেন।

আওরঙ্গজেব এই সব দেখে তাঁর নীতি ঠিক করে ফেললেন। তিনি এঁদের সঙ্গে ইচ্ছে করে খুব ভাল ব্যবহার করতে শুরু করলেন। সাক্ষাতে তাঁদের বলতেন, তাঁরা না থাকলে তাঁর কোন দাম নেই, তাঁর জীবন বৃথা। বলতেন, তাঁদের বন্ধুত্বকে তিনি জীবনের চেয়ে বেশি মূল্য দেন।

আর পত্রে?

পত্রে তিনি আলী মর্দান খানকে সম্বোধন করতেন 'পরম পুণ্যবান' বলে। সাদুল্লাহকে তিনি সম্বোধন করতেন 'মস্তিষ্ক-বোঝাই করা পরিকল্পনার মন্ত্রী' হিসেবে। আর সৈয়দ মিরানকে বলতেন, 'সৈয়দের সৈয়দ'।

পিতা-সম্রাট কিন্তু এগুলো ভাল চোখে দেখতেন না। বলতেন, "শাহজাদা তুমি, শাহজাদার মতো থাকবে। ওইসব মানুষকে এত লাই দেবে না। ওদের কাছে এত ছোট হবে না।"

আওরঙ্গজেব কি বলতেন জানো ?

বলতেন, "ছোট না হলে বড় হওয়া যায় না। ইজ্জত করতে না জানলে ইজ্জত পাওয়া যায় না।"

আসলে এইসব গুণ ছিল বলেই তিনি সব ভাইদের সাহসে, শক্তিতে, বুদ্ধিতে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন। সবাইকে ডিঙ্গিয়ে তিনি ভারতবর্ষের



সিংহাসনে আরোহণ করতে পেরেছিলেন। কেবল তা-ই নয়, তাঁর শাসনকালও ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি ছিলেন দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক।

আঠারো বছর বয়সে তিনি দাক্ষিণাত্যের গভর্নর হয়েছিলেন। তারপর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যে যুদ্ধ, তাতে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন।

এর কোনটাই কম গৌরবের কথা নয়।

আর যুদ্ধ করেছেন কয়টা জানো?

প্রথমে বসন্তীগড়ের যুদ্ধ।

তারপর সাতারার যুদ্ধ।

তারপর পারলিগড়।

পানহালা।

ওয়ার্দান গড়।

খেল্‌না।

কোন্‌দানা।

রাজগড়।

তোর্না।

ওয়াকিন্‌খেরা।

যুদ্ধ করতে হয়েছে, অবরোধ করতে হয়েছে সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে। রাজাকে বাঁচতে হলে রাজার মতো বাঁচতে হবে—এই নীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন বলে।

তাঁর চরিত্র কেমন ছিলো?

ব্যক্তিগত চরিত্র?

ভিন্নধর্মী ঐতিহাসিকরা কিন্তু তাঁকে গোঁড়া মুসলমান বলে বর্ণনা করেছেন। আসলেও তিনি তাই ছিলেন। ধর্ম ও ধর্ম-বিশ্বাস, বলতে গেলে, তাঁর জীবন ছিলো।

একটা ঘটনার কথা বলি।

আওরঙ্গজেবকে পাঠানো হয়েছিলো মধ্য এশিয়ার বল্‌খ্‌ ও বাদাখশান নামে দুটি রাজ্য অধিকার করার জন্য। কিন্তু তৈমুরলঙের বাহিনীর সঙ্গে তারা কিছুতেই পেরে উঠলো না।

প্রচুর লোকবল নষ্ট হলো।

কোটি কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হলো। ভেবে দেখো, তখনকার দিনের কোটি কোটি টাকা। আর শেষের দিকে লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্যভাণ্ডার ফেলে আসতে হয়েছিলো। কি করবে, মানুষ আনারই বাহন ছিলো না, তো রসদপত্র!

ওদের সঙ্গে পারেনি, কারণ ওই লোকগুলো ছিলো ভীষণ দুর্ধর্ষ। দারুণ সাহসী যোদ্ধা। আর পিঁপড়ের সারির মতো অগুণ্‌তি। কোন রকমে পশ্চাদপসরণ করে মানে মানে ফিরে এল আওরঙ্গজেবের বাহিনী।

ঘটনাটি সেই সময়কার।

বোখারার রাজা আবদুল আযীয খানের বিপুল বাহিনীর সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে মোগল সৈন্যরা। তুমুল যুদ্ধ চলছে। মোগলদের অবস্থা খুব সঙ্গিন।

তখন সময় হয়ে গেলো যোহর নামাযের।

হাতী থেকে নামলেন আওরঙ্গজেব।

নামায পড়বেন তিনি।

অফিসার, সৈন্য-সামন্ত সবাই তাঁকে বাধা দিলেন। পাগল হয়েছেন যুবরাজ? এই ভয়ানক প্রাণান্তকর যুদ্ধের ভিতর নামায! অসম্ভব!

কোন কথা শুনলেন না তিনি।

ওযূ করলেন। ধীরে সুস্থে নামায পড়লেন পূর্ণ তরিকামতে। উভয় দলের

সৈন্যদের, মারমুখী সৈন্যদের বিস্মিত চোখের সামনে তিনি অচঞ্চল গাম্ভীর্যের ভিতর দিয়ে নামায আদায় করলেন। ইচ্ছে করেই তিনি রুকূতে, সিজদায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিলেন।

বোখারার সুলতান আবদুল আযীয খান তো শুনে হৈ-হৈ করে উঠলেন।

আরে, আরে! এরকম মানুষের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হয় নাকি ? এরকম খোদাভীরু, ধর্মপ্রাণ মানুষের সঙ্গে যে করে করুক, আমি যুদ্ধ করতে পারবো না।

তিনি হুকুম দিলেন, যুদ্ধ বন্ধ।

ব্যস, যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলো। একটি ঘটনায় সমস্ত মুসলিম বিশ্বে নাম ছড়িয়ে পড়লো জিন্দাপীর আলমগীরের; আওরঙ্গজেবের।



১৭০৭ সনে ২০শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার যখন তিনি ইন্তিকাল করেন, তখনো তাঁর হাতে ছিলো তসবিহ, আর মুখে কালেমা।

কাজেই তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, একথা সত্য। কিন্তু এটাই তো তাঁর চরিত্রের একমাত্র পরিচয় নয়।

ভারতবর্ষের মতো এত বিশাল এক সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েও তাঁর মধ্যে আরো এমন অনেক গুণ ছিলো যা পৃথিবীর অন্য কোন সম্রাটের মধ্যে দেখা যায় না।

এত বড় সম্রাট। এত সাহস, এত শৌর্য, বীর্য! এত ধন-দৌলত! কিন্তু জীবন যাপন করতেন একেবারে সাধারণ একজন ফকির-সন্ন্যাসীর মতো।

একটা জিনিসকে তিনি ভীষণ পছন্দ করতেন। সে জিনিসই ছিলো তাঁর একমাত্র নেশা। সে বস্তুর নাম কাজ।

আর একটা বস্তুকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। সে জিনিসের নাম আরাম-আয়েস।

রোজ তিনি দরবারে বসতেন।

শুনতেন, প্রজাদের মধ্যে কার কি অভিযোগ আছে। শুনতেন, বিচার করতেন! প্রত্যেকটি দরখাস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি পড়তেন। প্রত্যেকটিতে নিজের হাতে আদেশ লিখতেন।

অনেকে কিন্তু অন্যরকম মনে করেন। যদিও প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনা এবং যতদূর সম্ভব তা লাঘব করা রাজার কর্তব্য, তথাপি একা সম্রাটের পক্ষে সমস্ত প্রজার সুখ-দুঃখ নিবারণ করা সম্ভব নয়। সাজেও না। সব কাজের জন্য লোক আছে তো! যার কাজ, তারই তা করা উচিত। আর সব কাজ সম্রাটই করবেন তো, তাঁর এত লোক-লস্কর কেন? আর এতে

তো অন্যান্য অফিসার-অমাত্যের কাজের প্রতি আগ্রহও কমে যেতো। সবাই বসে থাকতো, ভাবতো সম্রাটই তো আছেন, তিনিই তো করবেন, তিনিই তো চিন্তা করবেন; আমি খামাকা কেন কাজ করবো ?

যাই হোক, ওটা তাঁর নিত্যকার কর্ম ছিলো।

নিয়ম-কানূনের প্রশ্নে দারুণ কড়া ছিলেন তিনি।

দরবারে এলে দরবারের নিয়ম মানতে হবে।

যেখানে যাও, তা তুমি যতো বড়োই হওনা কেন, সেখানকার নিয়ম তোমাকে মানতেই হবে। কোন মাফ নেই। নিয়ম-কানূন মানবার বেলায় কোন আপস নেই। কোন খাতির নেই। তা তুমি রাজপুত্রই হও আর কৃষক পিতার সন্তানই হও। তিনি নিজেও কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম মানতেন।

বলতেন, "আমি সম্রাট, আমি নিয়ম বানিয়ে দিলাম। যে মুহূর্তে আমি নিয়ম তৈরি করলাম, সেই মুহূর্ত থেকে আমিও সেই নিয়মের দাস হলাম।"

প্রায়ই বলতেন, "আমিই যদি আমার নিয়ম ভাঙি, তাহলে সবাই নিয়ম ভাঙবে। আমি যদি একটা আইন অমান্য করি, তো সব আইন অমান্য করতে আমার মোটেই সময় লাগবে না। আমি একটা আইন ভাঙলে আমার উযির ভাঙবে দশটা.............।"

তিনি ভীষণ ধর্মভীরু ছিলেন।

কুরআন-সুন্নাহ্‌র নীতি ও আদর্শ তাঁর জীবনের নীতি ও আদর্শ ছিলো। কোন কিছুতেই তা থেকে বিচ্যুত হতেন না। নিজে তো গড়বড় করতেনেই না, কাউকে তা করতেও দিতেন না। যতো বড়ো ক্ষতিই হোক না, যতো বড় বিপদই আসুক না, তিনি শরীয়ত মেনে চলতেন। বিপজ্জনক প্রভাব, কোন রোষ, কারো ভালবাসা কিংবা কারো চোখের পানি—কিছুতেই তিনি নরম হতেন না।

ধর্মের প্রতি তাঁর এই কঠিন ভালবাসার জন্য তাঁর বিশ্বস্ত জনেরা তাঁকে একটা উপাধি দিয়েছিল।

আওরঙ্গজেব জিন্দাপীর!

তাঁর কি কোন দোষ ছিল না ?

ছিল, নিশ্চয়ই ছিল। দোষেগুণেই তো মানুষ।

এই যে একটু আগে বললাম, সব কাজ নিজের হাতে করতেন। রাজার জন্য এটা একটা দোষ।

তিনি সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। নিজের পুত্রদেরও। ফলে হতো কি, কেউ মন খুলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতো না। ফলে তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজকীয় গুণ ফুটে উঠতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোন সুযোগ্য উত্তরাধিকারী থাকেনি। ষাট বছরের বুড়ো হয়েও তারা বালকের মতো আচরণ করেছে।

দায়িত্ব বন্টন করেন নি বলে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব গড়ে উঠেনি। সুতরাং তিনি যে নিয়মের এত ভক্ত ছিলেন, সেই নিয়মই ভাল করে নির্মিত হতে পারেনি।

রাজাকে কেমন হতে হয় ?

একবার কাবুলের গভর্নর আমীর খান একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁর কাছে। পারস্য রাজ্যের কান্দাহারের এক থানাদার প্রস্তাব দিয়েছেন, কাবুলের চার মাইল ভিতরে একটা থানা করার অনুমতি দিলে প্রতি বছর পারস্যের বাদশাহ্ তাঁকে একশত পারসী ঘোড়া উপহার দেবেন।

আওরঙ্গজেব রাগে ফেটে পড়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, "চার মাইল কেন, আমার রাজ্যের চার হাত ভিতরেও অন্য কোন বিদেশীকে থাকতে দেবো না।"

তিনি বলতেন, "বিদেশীদের সম্বন্ধে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। ওদের সঙ্গে সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। কোন কোন দুষ্ট লোক আছে, তারা বসবার জায়গা দিলে শোবার জায়গা চায় এবং আস্তে আস্তে তাদের সাহস বেড়ে যায়।"

আর একবার তাঁর এক অমাত্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'এত এত রাজ্য জয় করেছেন তিনি। এত তাঁর প্রতাপ। এখন কিছুদিন উত্তর ভারতে এসে বিশ্রাম করলে তিনি শান্তি পাবেন।'

জবাবে আওরঙ্গজেব জানিয়েছিলেন, "সম্রাটের কোনদিন বিশ্রাম নিতে নেই। কাজই হলো রাজার শান্তি। তাঁর অন্য কোন শান্তির দরকার নেই।"

রাজার জন্য কি কোন উপদেশের প্রয়োজন আছে?

এমনও তো হতে পারে, তুমিও একদিন রাজা হয়ে গেলে এ দেশের? রাজা তো হতে পারবে না; প্রেসিডেন্ট হতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে। মন্ত্রী হতে পারবে। কিংবা বড় একজন অফিসার হতে পারবে। তখনই কিন্তু তোমাকে কিছু না কিছু 'রাজকার্য' করতে হবে। তাহলে তুমি কেমন করে কাজ করবে, কিভাবে, কোথায় কার সঙ্গে ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে অনেক নিয়ম, উপদেশ তোমাকে মেনে চলতে হবে।

তোমার তখন উপদেশ প্রয়োজন হবে।

এমনি কিছু উপদেশ কিন্তু আওরঙ্গজেবও রেখে গেছেন। তিনি তো খুব অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপদেশগুলো তৈরি করেছিলেন।

কতোদিন আগেকার উপদেশ!

কিন্তু এখনো সেগুলোর ধার কতো দেখো!

উপদেশগুলো তিনি দিয়েছিলেন পুত্র বাহাদুর শাহকে। কারণ, তাঁর মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ্ সম্রাট হবেন। হয়েছিলেনও। কাজেই উপদেশগুলোর নাম হতে পারে—'রাজার প্রতি রাজার উপদেশ'।

এক নম্বর উপদেশ ঃ রাজাকে কোমল হলে চলে না। আবার কঠোর হলেও চলে না। তাঁকে এই দুইয়ের মাঝামাঝি থাকতে হয়। বেশি কোমল হলে লোকে মনে করবে রাজা দুর্বল, কাজেই জনসাধারণ বেয়াদব হয়ে যাবে। রাজাকে হেনস্তা করবে, মান্য করবে না। রাজা যে রাজা, তখন প্রজারাও তার ঘাড়ে প্রায় চেপে বসতে চাইবে।

আবার বেশি কঠোর হলে, মানুষ ধারে কাছে ঘেঁষবে না। তখন বিশ্বাস করার মতো লোক পাওয়া যাবে না। বিশ্বাস করার মতো লোক না পেলে রাজা কাজ করাবেন কাকে দিয়ে ?

আর কথায় কথায় লোকজনকে শূলে চড়ায় যে রাজা, সে রাজার কপালে অনেক দুঃখ থাকে।

দুই নম্বর উপদেশ ঃ রাজার কোনদিন আরামপ্রিয় হওয়া উচিত নয়। তার ভোগে মত্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ পৃথিবীর বড় বড় সাম্রাজ্যের পতনের কারণ রাজাদের ভোগ-বিলাসে মত্ততা।

অতএব, রাজাকে সব সময় যতদূর সম্ভব চলাফেরা করতে হবে, কাজ করতে হবে।

তিন নম্বর উপদেশ ঃ রাজাকে সব সময় তাঁর লোক-লস্কর ও কর্মচারীদের যথার্থ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। কর্মচারীর কাজ কি, তা তাকে ভাল করে শিখিয়ে দিলে কাজ ভাল হয়। যে যে কাজের উপযুক্ত তাকে সে কাজেই নিয়োগ করতে হয়।

যে লোক কার্পেট বানায় তাকে দিয়ে কামারের কাজ করানো উচিত নয়।

বুড়ো মানুষের কাজ জোয়ান মানুষকে দিতে নেই। জোয়ান মানুষের যে কাজ তা বুড়ো মানুষকে দেবে না। কারণ বুড়ো মানুষ

জোয়ান মানুষের কাজ করতে লজ্জা পায়। আর বুড়ো মানুষের কাজ জোয়ান মানুষের পক্ষে করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

রাজ্যে বিশৃঙখলা আনার সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে জোয়ান মানুষকে বুড়ো মানুষের কাজ দেওয়া আর বুড়ো মানুষকে জোয়ান মানুষের কাজ দেওয়া।

এত বড়ো একজন সম্রাট, এত উচ্চ ছিল তাঁর আদর্শ! এত কাহিনী কিংবদন্তি তাঁর নামে।

কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন ভীষণ সাদাসিধে।

বড়ো বড়ো মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে না?

এই যেমন সকাল থেকে সন্ধ্যা, রাত্রি, কখন কি করেন তাঁরা—এইসব খুঁটিনাটি?

আমরা বুঝি না, বুঝতে চেষ্টা করি না, পৃথিবীর মহৎ লোক যাঁরা, তাঁরা সত্যিই সাধারণ মানুষের মতো খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, চিন্তা করেন কিনা!

কিন্তু ঠিক তোমরা যেমন প্রতিদিন একটা রুটিন মেনে চলো, বাড়ির রুটিন, স্কুলের রুটিন, তেমনি বড় বড় মানুষদেরও রুটিন থাকে।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৈনন্দিন জীবনের রুটিন ছিল নিম্নরূপ ঃ

সকাল	৫টা	ঃ	ঘুম থেকে ওঠা। ফজরের নামায। কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ।
	৭.৩০ মি.	ঃ	খাস কামরায় বিচার সংক্রান্ত কাজ।
	৮.৩০ মি.	ঃ	দর্শন—প্রজাদের দর্শন দান। বিশেষ বিশেষ কাজ পরিদর্শন—পর্যালোচনা। হাতীর লড়াই।
	৯.১৫ মি.	ঃ	দেওয়ান-ই-আম-এ বসা। দরবারের কাজ।

১১.০০ মি.	ঃ	কেউ কোন গোপনীয় কথা বলতে চাইলে, কোন গোপনীয় সংবাদ দিতে চাইলে তা শোনা।
১১.৫০ মি.	ঃ	হেরেমে প্রবেশ।
বিকাল ২টা	ঃ	যোহরের নামায।
২.৩০ মি.	ঃ	খাস কামরায় কাজ। পড়াশোনা, অন্যান্য কাজ। তারপর আসরের নামায। রাজকার্য।
৫.৩০ মি.	ঃ	দরবার-ই-খাস-এ সান্ধ্যকালীন অভিবাদন গ্রহণ, মাগরিবের নামায।
৬.৪০ মি.	ঃ	দেওয়ান-ই-খাস-এ সান্ধ্য সম্মেলন।
৭.৪০ মি.	ঃ	দরবারের দিনের কাজ শেষ। ইশার নামায।
৮টা.	ঃ	হেরেমে প্রবেশ। ধর্মীয় ধ্যান, পড়াশোনা, নিদ্রা।

এখানে সব সংক্ষেপে বলা আছে।

তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য একটু খোলাসা করে দিই।

ফজরের নামায

ফজরের নামায পড়তেন তিনি সব সময় ঠিক সময়ে। অর্থাৎ ঠিক সুবেহ্ সাদিকের সময়। দেওয়ান-ই-খাসের সঙ্গে মসজিদ ছিল। হেরেম থেকে তিনি সোজা ওখানে যেতেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নামায আদায় করতেন। তারপর বসতেন কুরআন শরীফ নিয়ে। কোন কোনদিন হাদীস শরীফও পড়তেন। এমনি করে চলতো সাড়ে সাতটা পর্যন্ত।

সাড়ে সাতটায় তিনি নাস্তা করতেন।

খাস কামরায় বিচার

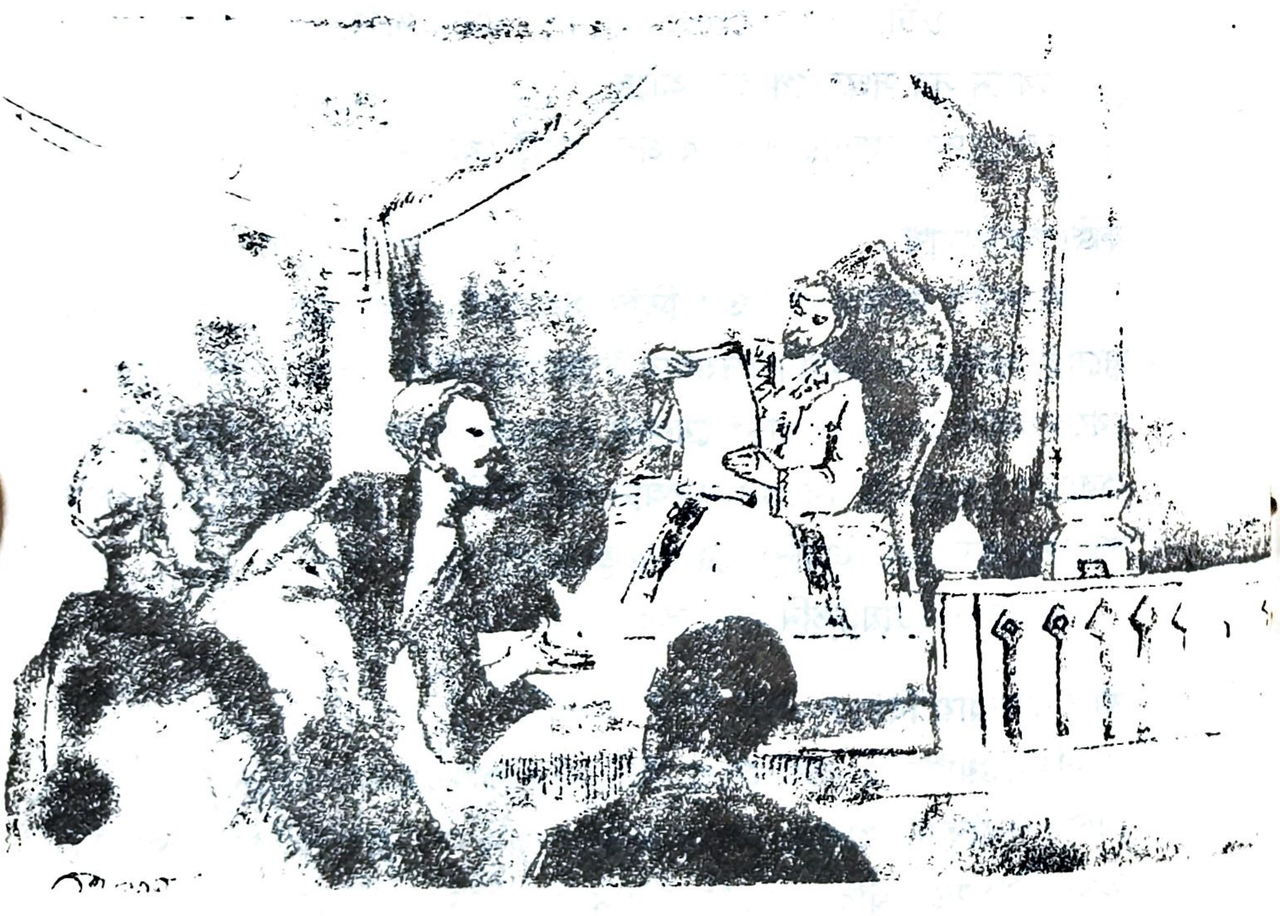
খিলওয়াতগাহ্ বলা হতো তাঁর খাস কামরাকে। ওখানে বসে তিনি বিচার করতেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত কতিপয় অফিসার এবং ব্যক্তিগত কর্মচারী তখন তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সিংহাসনে বসে তিনি আর্জি শুনতেন।

কোর্টের অফিসাররা নিয়ে আসতেন ফরিয়াদীদের, আসামীদের। যাদের কোন অভিযোগ থাকতো, তাদের। ঐসব লোক কখনো রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আসতো। আবার কখনো সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও আসতো। বিচারের জন্য, বিচারের মালিকের কাছে।

বাদশাহ্ সমস্ত আর্জি পড়তেন। সত্য বের করার চেষ্টা করতেন। পরে রায় দিতেন।

তাঁকে সাহায্য করতেন কোর্টের অফিসারবৃন্দ। আইনের বিষয়, আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে সুবিচারে সাহায্য করতেন।

এই বিচার সভাতেই গরীব ফরিয়াদীদের আবার টাকা-পয়সাও দেওয়া হতো সাহায্য হিসেবে।



দর্শন

যমুনা নদীর দিকে মুখ করে প্রাসাদে তাঁর শয়নকক্ষে একটি বাতায়ন ছিল। তার নাম ছিল 'দর্শন বাতায়ন'। ওখানে গিয়ে তিনি দাঁড়াতেন। বাতায়নের নিচে প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকতো বাদশাহ্‌কে এই সময়ে একনজর দেখার জন্য। প্রাসাদের নিচে সেই প্রাঙ্গণেই কিন্তু হতো হাতীর লড়াই।

দেওয়ান-ই-আম দরবার

দর্শন-দান সেরেই বাদশাহ্‌ বসতেন ছোট একটা কক্ষে। ওখানে বসে অন্যান্য সরকারী কাজ করতেন। ঘন্টা দুই চলতো এই কাজ।

এরপর এগারোটার সময় তিনি বসতেন দেওয়ান-ই-খাসে। ওখানে বসে তিনি কথা বলতেন নির্বাচিত লোকজনের সঙ্গে। ওখানে বসে গোপনীয় কাজও করতেন তিনি।

ওখানে প্রবেশ করতে পারতো কিছু পারিষদ, মুন্সী এবং অফিসের দরকারী লোকজন। এখানে বসে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর বা ভাইসরয়দের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট সম্রাটকে পাঠ করে শোনানো হতো। সম্রাট কোন কোন রিপোর্ট নিজে পাঠ করতেন। তারপর হুকুম জারী করতেন। হুকুম লেখা হতো, হুকুমের নকল তৈরি করা হতো। আবার ওখানে বসেই বাদশাহ্‌ তাতে সই করতেন, সীলমোহর বসাতেন।

এরপর প্রবেশ করতেন হেরেমে। দুপুরের খাওয়ার পর শ্রান্ত বাদশাহ্‌ দেহ ও মনকে বিশ্রাম দিতেন ঘন্টাখানেকের জন্য।

উঠে পরতেন কিন্তু যোহর নামাযের আগেই। উঠে নামায পড়তেন। তারপর ঢুকতেন তাঁর খাস কামরায়। খাস-কামরায় বসে তিনি ব্যক্তিগত কাজ করতেন।

ব্যক্তিগত কাজ বলতে ধর্মচর্চা, পবিত্র কুরআন পাঠ, পবিত্র কুরআনের কপি তৈরি করা, কুরআন-ভিত্তিক আইন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আর কি।

অথবা কোন আলিম-উলামার লেখা বই পড়তেন তিনি। ওখানে বসে আবার তাঁর প্রিয়পাত্র কোন অমাত্যের আনা সুপারিশ শুনতেন; ফরিয়াদও শুনতেন।

কোন কোনদিন বেশি ক্লান্ত হয়ে গেলে ওখান থেকে আবার হেরেমে যেতেন। ওখানে দুঃখী মহিলা, বিধবা বা ইয়াতিমদের দাবী-দাওয়ার কথা তিনি শুনতেন। কাউকে টাকা দিতেন, কাউকে জমি কিংবা অলংকার।

এর মধ্যে সময় হয়ে যেতো আসর নামাযের।

নামায পড়তে যেতেন খাস-কামরাসংলগ্ন মসজিদে। ওখান থেকে আবার ফিরে আসতেন খাস-কামরায়। আরো কিছু রাজ্য সংক্রান্ত কাজ করতেন।

সন্ধ্যার একটু আগে বাদশাহ্ যেতেন দেওয়ান-ই-খাসে। ওখানে সিংহাসনে বসতেন। ওখানে সৈন্য-সামন্ত, সিপাই-সান্ত্রী এবং প্রাসাদ-রক্ষীরা সারে সারে প্যারেড করতো। অভিবাদন জানাতো তাঁদের প্রিয় জাহাঁপনাকে। জাহাঁপনা নিত্যদিন নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতেন সে অভিবাদন। এটা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। রাজকীয় অনুশাসন অনুযায়ী রোজ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে হতো।

ওখানে বসতে বসতেই ধ্বনিত হতো মাগরিবের আযান।

গভীর মনোযোগ আর ভক্তির সঙ্গে আযান শুনতেন সম্রাট। আযান শেষ হতো।

তিনি সিংহাসন থেকে উঠতেন। যেতেন মসজিদে। সমস্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সঙ্গে এক জামাতে আদায় করতেন মাগরিবের নামায।

মসজিদ থেকে সম্রাট সোজা চলে আসতেন দেওয়ান-ই-খাস-এ। এসে সিংহাসনে বসতেন।

মন্ত্রী তাঁর কাছে রাজস্ব আদায়ের সংবাদ জানাতেন। কোথায় কি পরিমাণ আদায় হলো, কোথাও কোন সমস্যা আছে কি না এসব বলতেন। বাদশাহ্ শুনতেন—শুনে মন্তব্য করতেন, আদেশ দিতেন।

অন্যান্য কাজকর্মও সমাধা করা হতো প্রয়োজন হলে।

কিন্তু কোন নাচগানের বন্দোবস্ত ছিল না। আওরঙ্গজেব নিজেই তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ঘন্টা খানেকের উপর চলতো এ সভা।

তারপর ইশার নামাযের সময় হতো।

তখন দরবারও শেষ হতো।

বাদশাহ্ দেওয়ান-ই-খাসের পার্শ্ববর্তী মসজিদে নামায পড়তেন।

তারপর যেতেন হেরেমে।

কিন্তু হেরেমে ঢুকেই ঘুমোতে যেতেন না।

তিনি পড়তেন। ধ্যান করতেন কয়েক ঘন্টা। তারপর ঘুমোতেন।



আওরঙ্গজেবের রাজসভার ঐতিহাসিকের মতে তিনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র তিন ঘন্টা ঘুমোতেন।

তাহলেই দেখো, বাদশাহর জীবন সত্যিই কুসুমে আকীর্ণ নয়; বরং সে বড় কঠিন জীবন। কাজে আর কাজে ঠাসা জীবন।

তোমাদের কারো নিশ্চয়ই ধারণা ছিল, রাজা-বাদশাহ্‌র জীবন না জানি কতো আনন্দের, কতো সুখের! কিন্তু বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের দৈনন্দিন জীবনের বিবরণ শুনে এখন নিশ্চয়ই তোমাদের সে ধারণা পাল্টে গেছে।

আসলে আলস্যের জীবন ভাল নয়। কারণ অলস সময় ভরাট করে রাখার মতো কোন কাজ না থাকলে কিন্তু সময় নিজেই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তখন কি করি, কি করি ভাবনায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। অন্যদিকে যিনি কাজ পছন্দ করেন, কাজের মধ্যে নেশা খুঁজে পান, তাঁর কাজের মধ্যেই তিনি জীবনের সবচেয়ে সুন্দর আনন্দ খুঁজে পান।

কাজের ভিতর আনন্দ খুঁজে পেতেন বলেই বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব সারাজীবন কাজ করে গেছেন। এবং সাম্রাজ্যের কাজ করেও এমন আরো অনেক কিছু ব্যক্তিগত কাজ করে গেছেন যার পরিচয় পেলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।

ভাববে। ওমা! এত বড়ো বাদশাহ্, একি অদ্ভুত তাঁর মনোবৃত্তি। এমন সুন্দর মন কি মানুষের থাকা সম্ভব?

মৃত্যুর-পূর্বে তিনি একটি উইল করে গিয়েছিলেন। উইল বোঝ ত? উইল মানে ইচ্ছা। শেষ ইচ্ছার দলিলকে উইল বলা হয়। এতে লেখা থাকে একজনের মৃত্যুর পর তার কোন্ সম্পত্তি কে পাবে। আওরঙ্গজেবের উইলটি পড়লেই তোমরা বুঝবে কি সহজ, সাধারণ, নিরহঙ্কার, নির্লোভ আর খাঁটি ছিল এমন এক মহামহিম প্রবল প্রতাপান্বিত শাহানশাহের মন।

আওরঙ্গজেবের উইল এবং শেষ ঘোষণা—

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। যাঁরা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তাঁর অনুগত এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করেন তাঁদের সকলের ওপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

এতদ্বারা আমি আমার শেষ উইল আর ঘোষণাপত্র রেখে গেলাম ঃ

এক. আমি পাপীতাপী মানুষ। আমি মহা অপরাধী। আমার তরফ থেকে হযরত ইমাম হাসানের মাযারের উপর একটি গিলাফ দান করবে। কারণ যাঁরা পাপের সমুদ্রে ডুবে আছে তাদের ওই করুণা আর মার্জনার দরজার আশ্রয় প্রার্থনা করা ছাড়া আর গতি নেই। এই মহাসম্মানের কাজ সমাধা করার উপকরণ আমার সুযোগ্য পুত্র যুবরাজ আলিজার (আযম শাহ্) কাছে রক্ষিত আছে। এই কাজ করা হোক।

দুই. আমি টুপী তৈরি করে বিক্রি করতাম। সেই টুপী বিক্রি বাবদ চার টাকা দুই আনা মহলদার আইয়া বেগের কাছে আছে। ওই টাকা দিয়ে যেন অসহায় এই অধমের কাফনের কাপড় কেনা হয়। আমি কুরআন শরীফের অনুলিপি তৈরি করতাম। সেই বাবদ আমার মজুরীর আয় তিনশত পাঁচ টাকা আমার ব্যাগে আছে। ওটা ছিল আমার ব্যক্তিগত ব্যয়ের টাকা। আমার মৃত্যুর দিন ওই টাকা ফকিরদের মধ্যে যেন বিতরণ করে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআন নকল করে উপার্জন করা টাকাকে শিয়া সম্প্রদায় খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে, কাজেই ওই টাকা আমার কাফন বা ওই জাতীয় কাজে যেন ব্যয় করা না হয়।

তিন. যুবরাজ আলিজার (আযম শাহ্) লোকের কাছ থেকে আমার বাকি জিনিসপত্র যেন সংগ্রহ করা হয়। যুবরাজ আলিজাই আমার সন্তানদের মধ্যে নিকটতম উত্তরাধিকারী। আমার দাফন-কাফনের ভালমন্দ দায়-দায়িত্ব সব তাঁর উপরই ন্যস্ত থাকবে। তাঁর জন্য তো এই অসহায় অধম মানুষটির (আওরঙ্গজেবের) কিছু করণীয় নেই, কোন জবাবদিহিও করতে হবে না। কারণ মুর্দা জীবিতের দয়ার পাত্র।

চার. জীবন-পথের এই মুসাফিরকে যেন 'সত্য পথ থেকে বিচ্যুতির উপত্যকায়' খালি মাথায় কবর দেওয়া হয়। কারণ ধ্বংসপ্রাপ্ত মহাপাপীদের সেই রাজাধিরাজের (আল্লাহ্) কাছে অনাবৃত মস্তকে হাযির করলে সে তাঁর নিশ্চিত করুণা লাভ করে।

পাঁচ. খাটিয়ায় (শবযান) আমার দেহ রাখার পর তার ওপরে যেন একটি মোটা সাদা কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া হয়। কোন শামিয়ানা যেন টানানো না হয়। কোনরূপ জাঁকজমক করা না হয় যেন। যেন কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো না হয়। যেন কোন মিলাদ শরীফ পড়ানো না হয়।

ছয়. এই নির্লজ্জ অধমের আমলে তাঁর কিছু অনুগত ভৃত্য দাক্ষিণাত্যের মরুভূমি ও অরণ্যে ভবঘুরের মতো জীবন যাপন করছিল। আমার পর যে এই সাম্রাজ্য শাসন করবে, সে যেন সেই অসহায় খাদিমদের ভাল করে দেখাশোনা করে। তারা কোন অপরাধ করলেও তা যেন ক্ষমার চোখে দেখা হয়।

সাত. পারসীয়রা কেরানী হিসেবে খুব ভাল। এত উন্নত মানের কেরানী (মুৎসুদ্দি) অন্য কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। যুদ্ধেও তারা নির্ভরযোগ্য। বাদশাহ্ হুমায়ুনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোন পারসীয় যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি। কোনদিন তাদের পা কাঁপেনি। তদুপরি, কোনদিন তারা তাদের প্রভুদের অবাধ্য হয়নি। কোনদিন তাদের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কিন্তু তারা বড্ড বেশি সম্মান দাবী করে। সেজন্য তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলা কষ্টকর হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, আপসে তাদের খুশি রাখতে হবে। তাদের দাবী-দাওয়াকে কৌশলে এড়িয়ে যেতে হবে।

আট. তুরানীরা চিরকাল সৈন্য হিসেবে পরিচিত। ওরা আক্রমণে, বিশেষ করে নৈশ আক্রমণে এবং শত্রুকে গ্রেফতার করতে বেশ ওস্তাদ। যুদ্ধের মধ্যিখানে পশ্চাদপসরণ করার হুকুম দিলে তারা বিনাবাক্যে তা

পালন করে। কোন সন্দেহ, হতাশা বা লজ্জা বোধ করে না। ওরা হিন্দুস্তানীদের মতো একরোখা নয়। হিন্দুস্তানীরা শির দেবে তবু অবস্থান ত্যাগ করবে না। এই জাতির ভাল করতে চেষ্টা করবে। কারণ আপদে-বিপদে যে কোন কাজে এদের পাওয়া যায়।

নয়. বারহার সৈয়দদের প্রতি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করবে। কুরআন শরীফে আছে, 'রসূলের নিকট-আত্মীয়দের তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দেবে।' তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে কিংবা অনুগ্রহ প্রদান করতে কখ্খনো কার্পণ্য করবে না। এঁদের প্রতি ভালবাসার অর্থ হবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর নবুয়তের জন্য মূল্য প্রদান করা। কাজেই তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে যেন কোনদিন শৈথিল্য না হয়। তাতে এই জগত ও পরকালে লাভ হবে। তবে বারহার সৈয়দদের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে। অন্তর দিয়ে তাদের ভালবাসবে। কিন্তু বাইরে থেকে তাদের খুব একটা পদোন্নতি দেবে না। কারণ রাজ্য পরিচালনায় সহযোগী বেশি শক্তিশালী হয়ে গেলে, তারাই রাজা হয়ে যেতে চায়। তারা একবার লাগাম হাতে নিতে পারলে তোমার তাতে বিপদ হবে।

দশ. কোন রাজ্যের শাসনকর্তাকে যথাসাধ্য চলাফেরা করতে হয়। কোনক্রমেই তার এক জায়গায় থাকা উচিত নয়। থাকলে তাতে তার নিজের জীবনে আয়েস আসে সত্য, কিন্তু হাজার রকমের বিপদ এবং সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এগারো. তোমার পুত্রদের কখ্খনো বিশ্বাস করবে না। তোমার জীবদ্দশায় তাদের তোমার খুব কাছে আসতে দেবে না। তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশবে না। কারণ বাদশাহ্ শাহজাহান যদি দারাশিকোর প্রতি অন্তরঙ্গভাবে না মিশতেন তাহলে বোধ হয় তাঁর অবস্থা এত করুণ হতো না। 'রাজার বাক্য হবে কঠিন শুষ্ক', এই প্রবচনটি সব সময় মনে রাখবে।

বারো. সরকারের প্রধান ব্যক্তিকে রাজ্য সম্পর্কে বেশ ভাল করে সংবাদ রাখতে হয়। এক মুহূর্তের অবহেলা অনেক বছরের অপমানের কারণ হতে পারে। আমারই অসতর্কতার সুযোগে হতভাগা শিবা (শিবাজী) পালিয়ে যেতে পেরেছিল। ফলে মারাঠাদের কারণে সারাজীবন আমাকে কি যে কষ্ট করতে হয়েছে।

বারো খুব পয়মন্ত সংখ্যা। বারো দিয়েই আমি শেষ করলাম।

ইফাবা—৯৬-৯৭—প্র/৩৫৫৭ (উ)—৩,২৫০